ভূতুড়ে বাড়ি

(গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় মে ১৯৯০ সালে
শুকতারা পত্রিকায়)

টিক্ টিক্ টিক্ করে একটানা ঘড়ির আওয়াজ ----। দূরে অনেকগুলো কুকুর একসঙ্গে ডেকে উঠলো। সমুদ্রতরঙ্গের মত ছড়িয়ে পড়ছে আওয়াজটা ----। উচ্চগ্রামে উঠে আবার থিতিয়ে গেল। এরপর কিছুক্ষণ টিক্ টিক্ টিক্ ছাড়া আর কিছু শোনা যায়না ----। টিক্ টিক্ টিক্? নাকি ঠক্ ঠক্ ঠক্? বাইরে কোথাও হচ্ছে আওয়াজটা। কিন্তু ঘড়ি তো ঘরের মধ্যে রয়েছে, আওয়াজ বাইরে কেন? ওই তো আবার ! ঠক্ ঠক্ ঠক্। ঘড়ির আওয়াজটা আর আলাদা করে শোনা যাচ্ছে না। ঠক্ ঠক্ ঠক্ শব্দটা আরও কাছে এগিয়ে আসছে যেন ----। হ্যাঁ, ঠিক দরজার বাইরে এসে থামলো। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে আপাদমস্তক লেপমুড়ি দিয়ে রুদ্ধশ্বাসে উৎকর্ণ হয়ে শুনলাম। দরজার বাইরের অস্তিত্বটাও যেন কিছু শোনার চেষ্টায় উৎকর্ণ হয়ে আছে ----।

কতক্ষণ এভাবে কাটলো কে জানে ! হঠাৎ সচকিত হয়ে আবার পরিষ্কার শুনতে পেলাম - ঠক্ ঠক্ ঠক্। ঠিক দরজার বাইরে। ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে আওয়াজটা। শব্দটা মিলিয়ে যেতে দূরে একজোটে অনেকগুলো কুকুর ডেকে উঠলো। সমুদ্রের সুউচ্চ লহরীর মত আওয়াজটা উচ্চগ্রামে উঠে ছড়িয়ে থিতিয়ে গেল। ঘরের মধ্যে দেয়াল ঘড়ির টিক্ টিক্ টিক্ শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না ----।

পরপর তিনদিন ঠিক একই ভাবে ঘটে আসছে ব্যাপারটা। ঠিক কাঁটায় কাঁটায় রাত বারোটায়। ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ, দূরে কুকুরের ডাক, এগুলো স্বাভাবিক হতে পারে, কিন্তু এই ঠক্ ঠক্ শব্দটা কিসের? গেটের দরজায় সন্ধ্যারাত্রেই তালা মেরে দিই নিজের হাতে। দিনকাল ভাল নয়। নসুমামা পই পই করে বলে দিয়েছেন ---- এই পর্যন্ত বলে কিশোরীদা

অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। বিজন, সুনীল, তারক তক্কে তক্কে ছিল। ধাঁ করে কিশোরীদার ওষ্ঠাধরে সিগারেট গুঁজে তাতে অগ্নিসংযোগ করে ফেললো। অব্যর্থ টোপ। কিশোরীদা প্রসন্নচিত্তে কাহিনীতে ফিরে গেলেন ----।

নসুমামা বলেছিলেন, "বাবা কিশোরী, যেমন করে পারো বাড়িখানা বেচে বিলিয়ে আমাকে মুক্তি দাও বাবা। ভিটে তো নয়, গলার কাঁটা। না পারি গিলতে, না পারি তুলতে। মাঝখান থেকে এককাঁড়ি ট্যাক্সো দিতে দিতে ফতুর হয়ে গেলাম। তার উপর ক'বছর অন্তর গাঁটের পয়সা খরচ করে বাড়িঘর চুনকাম - মেরামত করিয়ে পিতৃপুরুষের ঋণ শোধ করো। আমি এদিকে যে ঋণে ঋণে ঝাঁঝরা হয়ে গেলাম ----।"

নসুমামার কাছে বচনবদ্ধ ছিলাম যেভাবেই পারি বাড়িখানা ওঁর ঘাড় থেকে না নামিয়ে আসছি না। তা সে যতদিন লাগে লাগুক। কেটে পড়ার পাঁয়তারা কষছি মনে মনে। তবে বাড়িটার কিছু একটা হিল্লে না করতে পারলে মান থাকে না। নসুমামাকে বড় গলা করে বলে এসেছি।

সকালে চা জলখাবার খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম। উকিল গজাননবাবুর বাড়িখানা নসুমামার ভিটে থেকে বেশি দূরে নয়। হাঁটা পথে মিনিট দশেকের মত লাগে। নসুমামা গজাননবাবুর কাছে চিঠি লিখে দিয়েছিলেন। আমি ওখানে কেন, কি উদ্দেশ্যে যাচ্ছি খোলসা করে জানিয়েছিলেন ওঁকে। চিঠিখানা আমার হাতেই পাঠিয়েছিলেন নসুমামা। গজাননবাবু বেশ খাতির যত্ন করেছিলেন। এমন কি এই কটা দিন ওঁদের বাড়িতেই থেকে যেতে বলেছিলেন। আমি অবশ্য রাজি হইনি। এই মাগ্যিগণ্ডার দিনে কেউ বললেই তো আর হুট্ করে তার ঘাড়ে সওয়ার হওয়া যায় না! শেষ অবধি গজাননবাবু মোড়ের পাইস হোটেলে আমার খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। ওঁদের চাকর বংশী দুবেলা আমার খাবার পৌঁছে দিয়ে যেতো। ঘরদোর ঝাড়পোঁছ, দু-একখানা কাপড়-চোপড় কেচে দেওয়া - এ সবই করতো বংশী। গজাননবাবু নিজেও বার দুই ঘুরে গেছেন। তবে বাড়িখানা বিক্রির ব্যাপারে খুব বেশি উৎসাহ দেখাননি। বরং বেশ এড়িয়েই গেছেন প্রসঙ্গটা এ যাবৎ। সেদিন সকালে গিয়ে সোজাসুজি বললাম, "বাড়ির একটা খদ্দের যোগাড় করে দিন গজাননবাবু, আমি এখানে আর থাকতে চাই না।"

গজাননবাবু চশমা জোড়া খুলে ধুতির খুঁট দিয়ে বেশ করে ঘষে

ঘষে মুছলেন।

তারপর বার দুয়েক কেশে গলা ঝেড়ে বললেন, "ইয়ে ---- তা ---- কি যেন বলছিলে ---- হ্যাঁ, তা বাড়িখানা ---- আসলে ব্যাপার হচ্ছে ---- ইয়ে ---- "

আমার কেমন যেন খটকা লাগলো। মনে হলো গজাননবাবু কিছু লুকোচ্ছেন, আমাকে সব কথা বলতে চাইছেন না।

আমি ঝপ্ করে কোপ বসালাম, "বাড়িটা ভূতুড়ে নয় তো গজাননবাবু?"

গজাননবাবু চমকে উঠে বললেন, "অ্যাঁ, কি বললে? তুমি কি তাঁদের দেখেছো?"

"তাঁদের মানে? কাদের?"

"ওই যে বললে ভূতুড়ে বাড়ি ! ওঁরা কি তোমাকে দেখা দিয়েছেন? কিংবা কোন সংকেত?"

গজাননবাবুর মেয়ে টুনু চা ও মোয়ার রেকাবি নামিয়ে রেখে বললো, "বাবা, মা বলেছে কিশোরীদা আজ দুপুরে আমাদের এখানে ঝোল ভাত খেয়ে যাবে।"

গজাননবাবু বললেন, "ঠিক আছে।"

তারপর টুনু চলে যেতে গলা নামিয়ে বললেন, "তোমরা আজকালকার শহুরে ছেলে। ভূতটুত মানতে চাও না। তাই সেদিন বলিনি। আসলে ওই বাড়িতে তোমার একা থাকাটা আমি আদতে পছন্দ করিনি। নসুবাবুই বা কি বলে তোমাকে পাঠালেন ! ওই বাড়ি বেচা কি আর চাট্টিখানি কথা? শখ করে কেই বা কিনতে যাবে অমন দুর্নামওলা বাড়ি?"

"দুর্নাম মানে? ওখানে কি কিছু ঘটে গেছে?"

"আলবৎ। গত দশবছর খালি পড়ে আছে বাড়িখানা। খালি বাড়ি মানে সদর দরজায় তালা ঝুলছে, ভেতরের ব্যাপার আর কে জানতে যাচ্ছে বলো? যে রকম দিনকাল। নকশাল, টেররিস্ট, স্মাগলার, ছেলেধরার দল যখন যে পেরেছে দখল করেছে ও বাড়ি। আর এ ক্ষেত্রে যা ঘটে - ছোরাবাজি, গুমখুন, আত্মহত্যা আকচার লেগেই আছে। ভূত - প্রেত - দত্যি - দানো কি যে নেই এসব বাড়িতে!"

পরপর তিন রাত কাটিয়েছি ওই বাড়িতে। আর এখন ফটফটে দিনের বেলা গজাননবাবুর বৈঠকখানায় বসে মেরুদণ্ড শিরশির করে উঠলো বাড়ির বর্ণনা শুনে। তালু শুকিয়ে কাঠ, হাঁটুতে হাঁটুতে ঠোকাঠুকি হতে লাগলো। গজাননবাবু বললেন, "এক উপায় আছে। আমারই এক মক্কেল অরিমর্দন পাণ্ডে, চালানি কাঠের ব্যবসা করে। কাঠগোদামের জন্যে জমি খুঁজছে। তা আমার কথা ফেলবে না। ওকে ধরাধরি করে বোধহয় নসুবাবুর বাড়িখানা কিনতে রাজী করাতে পারবো। তবে দাম বেশি পাওয়া যাবে না। অবশ্য এ ক্ষেত্রে যা পাওয়া যায় তাই লাভ। ভূতুড়ে বাড়ি বলে কথা! এন্‌তার খুনখারাপি হয়ে গেছে ওখানে। সেই সব অভিশপ্ত আত্মারা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ওখানে কি মানুষ থাকে! না থাকতে পারে!"

শেষ অবধি তাই হলো। নসুমামার বাড়িখানা জলের দরে বিক্রি হয়ে গেল। বাড়ি বিক্রির সময় অবশ্য নসুমামা নিজে গিয়ে দলিলপত্রে সই করে এলেন। সব কিছু সুভালাভালি মিটে যাবার পর আমাকে ভজগোবিন্দ রেস্টুরেণ্টে নিয়ে গিয়ে ভরপেট খাইয়েছিলেন নসুমামা।

পিঠ ঠুকে বলেছিলেন, "বাবা কিশোরী ! শুধু তোমার চেষ্টাতেই বাড়িখানা ঘাড় থেকে নামাতে পেরেছি। এ সবই তোমার কৃতিত্ব।" তারপর একটু ইতস্তত করে বললেন, "আমার একটা ভারি অন্যায় হয়ে গেছে বাবা, ওই হানাবাড়িতে তোমাকে তেরাত্তির বাস করতে হলো আমার কথা শুনে। বিশ্বাস করো, আমি এর বিন্দুবিসর্গও জানতাম না। বাড়িটা বহু বছর খালি পড়ে ছিল বটে, কিন্তু মাঝে মধ্যে গিয়ে ঝাড়পোঁছ মেরামত করিয়ে এসেছি বরাবর। সৃষ্টির যত ভূতের দল যে ইতিমধ্যে ওখানে আড্ডা গেড়েছে তা কি তখন জানি? দেখো বাবা, এ কথাটা মেজদির কানে যেন ঘুণাক্ষরেও না ওঠে। আমি আর তাহলে লোকসমাজে মুখ দেখাতে পারবো না। খুনে মামা বলে দুয়ো দেবে সবাই।"

"অরিমর্দন পাণ্ডে বাড়ি কিনতে আপত্তি করলো না?"

নসুমামা বললেন, "ওর সঙ্গে কথা হয়নি আমার। আপাতত গজাননবাবুই নিলেন বাড়িখানা। পরে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পাণ্ডের ঘাড়ে চাপাবেন। সে যাকগে। আমার ওসব নিয়ে মাথা ব্যথায় কাজ কি? নগদ তেরো হাজার টাকা পেলুম। সাধারণ বাড়ি হলে আরও পাঁচগুণ দাম

হতো। কিন্তু অতগুলো ভূতসুদ্ধ বাড়ি নেবে কে?"

কিশোরীদা সিগারেট ধরিয়ে নীরব হলেন।

সুনীল বললো, "তারপর?"

কিশোরীদা একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, সাত-আট বছর আগের ঘটনা এসব। ও তল্লাটে গেলে দেখতে পাবে। সে বাড়িতে এখন অন্তত আট ঘর বাসিন্দা। রঙচঙ আর পার্টিশান করে বাড়ির ভোল পাল্টে দিয়েছেন গজাননবাবু । আজকের গজানন অ্যাপার্টমেন্ট্স্ দেখে কে বলবে ওই বাড়িতে আগে ভূতের ছড়াছড়ি ছিল। গজাননবাবু ওকালতি ছেড়ে বাড়ি ভাড়ার টাকায় দিন গুজরান করছেন এখন। লোকে বলে, এমনিতেও এমন কিছু পসার ছিল না। মক্কেলের প্রত্যাশায় আদালতের বাইরে দাঁড়িয়েই দিন কাটতো তাঁর। চলতি ভাষায় বলতে গেলে উনি একজন 'আউটস্ট্যাণ্ডিং' উকিল ছিলেন বরাবর।

"আর নসুমামা?"

"আর বলো কেন ! যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর। অত কষ্ট করে বাড়িখানা বেচে দিলাম আর এখন আমিই যত দোষের ভাগী। সেই কবে 'ভজগোবিন্দে' খাইয়েছিলেন নসুমামা, তারপর কি যে হলো এখন আর মুখদর্শন করেন না আমার। সবাইকে বলে বেড়ান আমার বোকামিতেই নাকি ওঁর লাখ টাকার সম্পত্তি বে-হাত হয়ে গেল। কলিকাল আর বলে কাকে ----!"